বৌদ্ধশাস্ত্রে পুরুষতন্ত্র:

নারীরা হল উন্মুক্ত মলের মতো দুর্গন্ধযুক্ত

নিলয় নীল

সূচীপত্র

ভূমিকা 3
কুণাল জাতক 4
বিদুরপণ্ডিত জাতক 10
নন্দ জাতক 11
শত্তুভস্ত্রা জাতক 11
অশাতমন্ত্র জাতক 12
অন্ধভূত জাতক 14
দুরাজান জাতক 16
অনাভিরতি জাতক 17
পর্ণিক জাতক 17
সেগগু জাতক 18
বন্ধনমোক্ষ জাতক 19
বোধিসত্ত্ব 20
রাধা জাতক 21
মৃদুপাণি জাতক 22
সমুদ্গ জাতক 23
সুজাতা জাতক 25
সম্বুলা জাতক 27
কুশ জাতক 29
উৎসঙ্গ জাতক 31
ন্যগ্রোধ জাতক 33

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে নারীজীবন সংসার তথা বিবাহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। নারীর শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য যথাক্রমে পিতা-স্বামী-পুত্রের দ্বারাই নির্ধারিত থাকতো। এর ফলে পুরুষ-অধীনতা নারীর জন্য হয়ে পড়ে অপরিহার্য। হিন্দুধর্মের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত উত্তম ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্মের আগমন ঘটে এই ভারতে। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ থেকে শুরু করে ঈশ্বরের প্রচলিত আরাধনার মতো অনেক কিছুই এখানে অনুপস্থিত ছিল বলে একে আপাতদৃষ্টিতে উত্তম ধর্ম বলেই গণ্য করেন অনেক দার্শনিক।

অ্যাকাডেমিক ও নন-অ্যাকাডেমিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে দেখেছি, আর সব প্রচলিত ধর্মমতের মতোই বৌদ্ধধর্মে আছে সমসাময়িকতার প্রবল প্রভাব। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং আজকে আমরা আলোচনা করবো বৌদ্ধধর্মে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাবলয় নিয়ে। এই আলোচনা করার অন্যতম কারণ হল, আমাদের বাঙালির মধ্যে অনেকের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে না জেনেই এই ধর্মের প্রতি এক ধরনের অনুরাগ কাজ করে। বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বাংলা ভাষায় বিশেষ করে অনলাইনে ততোটা আলোচনা বা সমালোচনা আমি কখনোই দেখিনি, যতটা ইসলাম বা হিন্দু ধর্ম নিয়ে হয়ে থাকে।

গৌতম বৌদ্ধ বিতৃষ্ণ ছিলেন তৎকালীন সাংসারিক জীবনাবর্তে। এই জন্য তিনি তার স্ত্রীকেও ত্যাগ করেন। যেহেতু সংসারে বসে অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালন করে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়, সেহেতু অবশ্যই সাংসারিক মায়া ও কাম ত্যাগ করে গৃহত্যাগী হতে হবে। আর সাংসারিক মায়া ও কাম ত্যাগ করার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে নারীকে চিহ্নিত করেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি বলেন, নারী যেহেতু গৃহের মোহ তৈরি করে, তাই নারী অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

সমগ্র বৌদ্ধ বাণীকে তিন ভাগে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামে অভিহিত করা হয়। এদেরকে একত্রে বলা হয় ত্রিপিটক। যেহেতু আমরা বৌদ্ধধর্মে নারীদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করবো, সেহেতু আমাদের বেশীর ভাগ আলোচনাই হবে সূত্রপিটকের খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত জাতকের কাহিনীতে আলোচিত নারীর প্রতি গৌতম বুদ্ধের নির্দেশনামূলক বক্তব্য। জাতক কাহিনীতে নীতিকথা সম্পন্ন হয় সাধারনত তিনটি পর্যায়ে, যথা:

১. বর্তমান বস্তু (এখানে কোন সংকট উপস্থাপিত হয়েছে শাস্তার (পথপ্রদর্শকের) কাছে,

২. অতীত বস্তু (এখানে সংকট মীমাংসার জন্য অতীতের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন শাস্তা),

৩. সমাধান (অতীত বাস্তবতার আলোকে বর্তমানের টীকাভাষ্য রচনা করে দিকনির্দেশনা দেন শাস্তা)।

কুণাল জাতক

আমরা প্রথমে আলোচনা করবো ৫৩৬ নম্বর জাতক, যার নাম কুণাল জাতক। এই জাতকের প্রধান চরিত্র হলেন কুণাল*, যিনি নারীদের সম্পর্কে নীতিকথা বলেন। কুণাল বলেন নারী কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়, নারী স্বভাবতই বিশ্বাসঘাতিনী। নারী কোনোভাবেই প্রশংসার যোগ্য নয়। পৃথিবী যেমন সকলের আধার, তেমনি নারীও কামাচারে পাত্রাপাত্র বিচার করে না। কুণালের মুখে উচ্চারিত হয় নীতি গাথা:

সদা রক্তমাংস প্রিয়, কঠোর হৃদয়,
পঞ্চায়ুধ, ক্রূরমতি সিংহ দুরাশয়।
অতি লোভী, নিত্য প্রতিহিংসা পরায়ণ,
বধি অন্যে করে নিজ উদর পূরণ।
স্ত্রীজাতি তেমতি সর্বপাপের আবাস,
চরিত্রে তাহাদের কভু করো না বিশ্বাস।

কুণালের মতে, নারীকে বেশ্যা, কুলটা বললেই সব বলা হয় না, নারী প্রকৃত পক্ষে এর অধিক কিছু। নারীরা হল:

- উন্মুক্ত মলভাণ্ডের মতো দুর্গন্ধ যুক্ত।
- বিষমিশ্রিত মদিরার মতো অনিষ্টকারী।
- কুটিলা সাপের মতো দুই জিহ্বা বিশিষ্ট।
- পাতালের ন্যায় অতল গভীর।
- রাক্ষসীর ন্যায় সন্তোষহীন।
- অগ্নির ন্যায় সর্বগ্রাসিনী।
- নদীর ন্যায় সর্ববাহিনী।
- বায়ুর ন্যায় যথেচ্ছা গামিনী।
- বিষবৃক্ষের ন্যায় বিষফল প্রসবিনী।

কুণাল বলেন, নারী হল উন্মুক্ত মলভাণ্ডের ন্যায়। উন্মুক্ত মলভাণ্ড দেখিলে মাছি সেখানে ঝাঁপ দিবেই, তাকে রোহিত করা কষ্টকর। কিন্তু একজন জ্ঞানী মানুষ সব সময় এই মলভাণ্ডের দুর্গন্ধ উপলব্ধি করে তা এড়িয়ে চলে। তদ্রূপ

* এক বিজ্ঞ পাখী।

নারীরূপ মলভাণ্ডে মাছিরূপ পুরুষ ঝাঁপ দিবেই, কিন্তু একজন জ্ঞানী ভিক্ষু এই উন্মুক্ত মলভাণ্ডরূপ নারীদের দুর্গন্ধ উপলব্ধি করিয়া তাদের সদাই পরিত্যাগ করেন। কুণাল নীতিগাথায় বলেন–

চৌর, বিষদিগ্ধসুরা, বিকত্থী[†] বণিক
কুটিল হরিণশৃঙ্গ, দ্বিজিহ্বা সর্পিণী
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।
প্রতিচ্ছন্ন মলকুপ, দুষ্কর পাতাল
দুস্তোষা রাক্ষসী, যম সর্বসংহারক
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।
অগ্নি, নদী বায়ু, মেরু (পাত্রাপাত্রভেদ
জানে না যে) কিংবা বিষবৃক্ষ নিত্যফল–
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।
নাশে নারী ধনরত্ন, ভোগের সামগ্রী
গৃহে যাহা আনে পতি করিয়া যতন।

বৌদ্ধশাস্ত্রের ৫৩৬ নম্বর জাতকে কুণাল পুরুষদের উপদেশ দেন – বলদ (ষাঁড়), ধেনু (গাভী), যান (বাহন) ও রমণী এই চারটি কখনো অন্যের আশ্রয়ে রাখতে হয় না। এদেরকে নিজের আশ্রয়ে সুরক্ষিত রাখতে হয়, তা না হলে সংকট তৈরি হয়। এই সম্পর্কিত নীতিগাথায় তিনি বলেন–

বলীর্বদ, ধেনু, যান, ভার্য্যা নিজ তব
রাখিও না অন্য গৃহে কখনো এ সব।
যান নষ্ট হয় পড়ে আনাড়ির হাতে
বলীর্বদ প্রাণে মরে অতি খাটুনিতে।
দুধ দুয়েয়ে বাছুরের জীবনান্ত করে
রমণী প্রদুষ্টা হয় থাকি জ্ঞাতিঘরে।

আবার কুণাল বলেন, সব নারীই বেশ্যা। এরা পঙ্গু দেখলেও ব্যাভিচারে রত হয়। সব নারীই হচ্ছে পরপুরুষগামিনী এবং বিশ্বাস অযোগ্য। আসুন দেখি কুণাল তার নীতিগাথায় কী বলেছেন:

[†] বিকত্থী = অহঙ্কারী।

পাইলে নিভৃত স্থান, পেলে অবসর
হেন নারী নাই এই পৃথিবী ভিতর।
না করিবে পাপ যেই, না পেলে অপরে
পঙ্গুর সহিত রত হয় ব্যাভিচারে।
সত্য বটে ভাবে লোকে সুখদা রমণী
কিন্তু সর্ব নারী পরপুরুষগামিনী।
দমিতে নারীর মন নিগ্রহের বলে
শক্তি কাহারো নাই এ মহীমণ্ডলে।
প্রিয়ঙ্করী, তবু এরা বিশ্বাস অযোগ্যা,
বেশ্যা, তীর্থবৎ এরা সর্বজন-ভোগ্যা।

এইবার কুণাল বলেন, কী কী কারণে স্ত্রীদের কলঙ্ক হয়। কুণালের মতে যেসব কারণে নারীদের কলঙ্ক হয় তার মধ্যে রয়েছে–

- আরামে উদ্যানে ভ্রমণ করলে।
- জ্ঞাতি কুটুম্বের বাসায় বেড়াতে গেলে।
- মদ্য পান করলে।
- বিচিত্র জামা কাপড় পড়তে চাইলে।
- বিনা কাজে ঘোরাঘুরি করলে।
- অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।
- দরজায় বা জানালায় দাঁড়িয়ে বা চেয়ে থাকলে।

কুণাল তাঁর নীতিগাথায় এ সম্পর্কে বলেন:

আরামে, উদ্যানে, তীর্থে, জ্ঞাতিপর কূলে সদা
বেড়াইতে যায়,
মদ্যপান করে যারা, পরিতে বিচিত্র বস্ত্র
সদা যারা চায়,
বিনা কাজে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে যারা
সদা শূন্যমনে,
দ্বারে থাকে দাঁড়াইয়া– কলুষিতা হয় নারী
এই নব কারণে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রের ৫৩৬ নম্বর জাতকে কুণাল আরও বলেন:

- গরুরা নতুন ঘাসের আশায় নিজের গোয়াল থেকে বের হবার জন্য ছোটে, নারীও তেমনি নতুন নাগর লাভের আশায় ছোটাছুটি করে।
- নৌকা যেমন এপারে-ওপারে, এখানে-সেখানে যথা প্রয়োজনে লাগে, নারীও তদ্রূপ প্রিয়-অপ্রিয় বিবেচনা না করেই সর্বপুরুষেই গমন করে।
- কোন বুদ্ধিমান কখনো নারীর চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে না। যারা করে তারা নির্বোধ।
- যতই নারীকে ধনে পরিপূর্ণ করা হোক না কেন, সুযোগ পেলেই অসতীরা পুরুষের সম্মান নষ্ট করে।
- নারীদের এতোই জঘন্য স্বভাব যে, এখানে-সেখানে তারা যদিচ্ছা ঘুরাফেরা করে।
- নারীদের চোখের জলেতে গলে যাওয়া ঠিক না, কারণ নারীদের সত্য-মিথ্যা সমান।
- নারীরা সব সময় প্রেমালাপে পুরুষদের বশ করে, যদিও মনের মধ্যে তাদের থাকে খারাপ অভিলাষ।
- তীর্থে যেমন সকলেই ভ্রমন করতে পারে, নারীও তেমন তীর্থসম।
- টাকাহীন কুলীন ব্রাহ্মণ নারীর কাছে চণ্ডালের মতো। তাইতো ধনবান চণ্ডালকে নারী আজীবন পূজিতে পারে শুধু ধনের আশায়।

আসুন এই বিষয়ে আমরা কুণালের নীতিবাক্যর গাথাগুলো দেখি:

"মনের মতো রমণী লভিয়া
ধনপূর্ণা ধরা কর তারে দান,
তথাপি অসতী পেলে অবসর
কভু না রাখিবে তোমার সম্মান।
নারীর এমন জঘন্য স্বভাব
সদা সর্বস্থানে করি বিলোকন,
করে কি কখনো বুদ্ধিমান জন
চরিত্রে তাহাদের বিশ্বাস স্থাপন?
ভালবাসে মোরে, ভাবি ইহা মনে
করো না বিশ্বাস কভু নারীগণে,
অশ্রুপাত যেন দেখিয়া তাহার
ভিজে নাকো মন কখনো তোমার।
এ পারে, ও পারে নদীর যেমন
লাগে গিয়া নৌকা, যথা প্রয়োজন,

প্রিয় বা অপ্রিয় বিচার না করি
সেবে সমভাবে সর্বজনে নারী।
অতীব দুঃশীলা, অতি অসংযতা
রতিদানে মূঢ়ে তুষিতে নিরতা,
প্রেমালাপ করে বসি তব পাশ
মনে কিন্তু সদা পাপ অভিলাষ।
তীর্থসম সর্বভোগ্যা নারীগণ,
নারীরে বিশ্বাস করো না কখন।
নাই তাহাদের সত্যমিথ্যা জ্ঞান
সত্য তাহাদের মিথ্যার সমান।
গবীগণ নব তৃণের আশায়
গোচর-বাহিরে ছুটি যথা যায়,
নবীন নাগর লভিতে তেমনি
ছোটাছুটি করে সকল রমণী।
নির্ধন কুলীনে নারী করে হেয় জ্ঞান
সে জন নারীর চক্ষে চণ্ডাল সমান,
অথচ চণ্ডাল যদি হয় ধনেশ্বর
ধনহেতু ভজে তারে নারী নিরন্তর।”

বৌদ্ধশাস্ত্রের ৫৩৬ নম্বর জাতকে কুণাল আর গৃধ্ররাজের‡ মধ্যে কথোপকথন প্রণিধানযোগ্য। এখানে গৃধ্ররাজের কাছে কুণাল নারীচরিত্র কেমন, তা বর্ণনা করেন। নারীর প্রকৃত চরিত্র কেমন, সে সম্পর্কে কুণাল যা যা বলেন, তা হল:

- ব্রাহ্মণ, সাগর, নরপতি আর নারী এই চারকে কখনোই কেউ সন্তুষ্ট করতে পারে না।
- একজন নারীর যদি আটজন সেক্সি স্বামীও থাকে তারপরও সে নবম জনার প্রতাশা করে।
- নারীর জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো যোনী সব সময়ই অপূর্ণ থাকে।
- নারী অগ্নির মতো সব কিছু গিলে খায়।
- নারী নদীর মতো সব দিকে প্রবাহিত হয়।
- নারী হল কাটা গাছের ন্যায়।
- নারী সব সময় পুরুষের দুঃখের কারণ হয়।
- নারী ধনের জন্য কুপথে যায়।

‡ শকুন পাখিদের রাজা।

- নারী নিজের স্বামীকে সেবা না করে পরপুরুষকে সেবা দেয়।
- নারী যেহেতু অধঃগামী, তাই তাদের নরক নিশ্চিত।

এইসব কারণেই বুদ্ধিমানের অবশ্যই নারীকে পাশ কাটিয়ে চলা উচিত। আসুন, কথা না বাড়িয়ে আমরা কুণালের মতে নারী চরিত্রের নীতিগাথা শুনি।

“নারীর চরিত্র আমি বলিতেছি আজ
সাবধানে শ্রবণ করহ, গৃধ্ররাজ।
সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, নরপতি আর নারী
পূরিতে কাহারো সাধ্য নাই এই চারি।
এক রমণীর যদি হয় অষ্ট পতি
বীর বলবান সবে, কামপ্রদ অতি
লভিতে নবম তবু চায় সেই মনে
উণত্ব অপূর্ণ তার থাকে সর্বক্ষণে।
অগ্নিসম সর্বভক্ষ্যা সকল রমণী
নদীসমা সর্বনারী সর্বপ্রবাহিণী;
কন্টকশাখার তুল্য রমণী সকল
পুরুষের হয় হেতু দুঃখের কেবল।
ধনলোভে সব নারী কুপথেতে যায়
ত্যাজি পতি রতা পরপুরুষ সেবায়।
নারীর গমন সদা অধঃপথে
মরণের পর নরকে নিবাস;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে
দুর হতে ত্যাজে নারীদের পাশ।
ডুবিলে নারীর মায়ার আবর্তে
ব্রহ্মচর্য পায় অচিরে বিনাশ,
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে
দূর হতে ত্যাজে রমণীর পাশ।”

বিদূরপণ্ডিত জাতক

এবার আমরা আলোচনা করবো ৫৪৫ নম্বর জাতক, যার নাম বিদূরপণ্ডিত জাতক। বিদূরপণ্ডিত জাতকের মূল চরিত্রে আছেন মহাপণ্ডিত বিদূর। এই মহাপণ্ডিত মহাপুরুষ বিদূরের ছিল মাত্র এক সহস্র ভার্য্যা এবং সপ্তশত গণিকা। যৌনতা সম্পর্কে অত্যধিক অভিজ্ঞ পণ্ডিত বিদূরের কাছে আমরা জানতে পারবো যৌনবিজ্ঞান সম্পর্কে। পণ্ডিত বিদূরের মতে – অত্যধিক নারীর সহিত মিলনে পুরুষের বীর্যক্ষয় হয়। যেহেতু একজন বীর্যবান পুরুষের কাছে সব থেকে মূল্যবান বস্তু হল তার বীর্য, তাই যে কোনো প্রকারেই হোক এই মহামূল্যবান বীর্যকে সংরক্ষণ করতেই হবে। আর পুরুষের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, এই বীর্য সংরক্ষণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল নারী। খালেদা জিয়া যেমন শ্লোগান দিয়েছেন: "দেশ বাঁচাও, মাটি বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও, হাসিনা হটাও," ঠিক তেমনি মহাপণ্ডিত বিদূরের শ্লোগান ছিল: "পুরুষ বাঁচাও, বীর্য বাঁচাও, পুরুষত্ব বাঁচাও, নারী হটাও।" আসুন, এখন কথা না বাড়িয়ে আমরা মহাপণ্ডিত বিদূরের কাছ থেকে নারী সম্পর্কিত নীতিগাথা গুলো শুনি:

অত্যধিক স্ত্রী সংসর্গে হয় তেজঃক্ষয়,
কাশ, শ্বাস, দুর্বলতা, সর্বাঙ্গে বেদনা,
বুদ্ধির বিলোপ আর। এসব কুফল
দেখি স্ত্রী সংসর্গে সদা হয় মিতাচার।
ধনরত্নে পরিপূর্ণা বসুন্ধরা যদি
দেয় কেহ রমণীকে, ভাবি ইহা মনে,
আমিই ইহার প্রিয়, অন্য কেহ নয়,
অবকাশ পেলে কিন্তু সেই নারী আবার
করিবে সে পুরুষকে তৃণবৎ জ্ঞান।
নারীর চরিত্রে হেন কলুষতা হেরি
অসতীর সঙ্গ ত্যাগ করে ধর্মবিদ।

নন্দ জাতক

নারীরক্ষা পুরুষতন্ত্রের জন্য অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ। নারীদের যে কখনোই বিশ্বাস করতে হয় না, তার দৃষ্টান্ত আমরা পাই ৩৯ নম্বর জাতকে, যার নাম নন্দ জাতক। এই জাতকের অতীত বস্তুতে দেখা যায়, এক বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রীর গর্ভে একটা পুত্রসন্তান জন্মায়, তখন এ সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ বলে, "আমার স্ত্রী যুবতী, আমার মৃত্যু হলে না জানি অন্য কোন পুরুষকে আশ্রয় করবে।" এভাবেই স্ত্রীকে সন্দেহ করে যাচ্ছে পুরুষ, যদিও পুরুষকে সন্দেহ করার অধিকার পুরুষতন্ত্র দেয়নি নারীকে।

শক্তুভস্ত্রা জাতক

শক্তুভস্ত্রা[§] জাতক নামক ৪০২ নম্বর জাতকের অতীত বস্তুতে দেখা যায়, এক ব্রাহ্মণ তার ভিক্ষালব্ধ জিনিষ অন্য এক ব্রাহ্মণের হেফাজতে রাখে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ তা খরচ করে ফেলায় আপন কন্যার সাথে প্রথম ব্রাহ্মণের বিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত ঋণমুক্ত হয়। এখানে নারীকে বিক্রয় করা হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। পিতা দায়মুক্ত হল ঠিকই, কিন্তু কন্যার কথা চিন্তা করল না। যুবতী কন্যা বাবার বয়সী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সহবাসে তৃপ্ত না হওয়ায় এক তরুণ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। আর এর মাধ্যমেই তরুণী যে কতো বড় বেশ্যা, তা ইনিয়ে বিনিয়ে বোঝানো হয়েছে এই জাতকটিতে।

[§] শক্তু = ছাতু, ভস্ত্রা = বস্তা।

অশাতমন্ত্র জাতক

পুরুষতন্ত্রের নিকট নারীর দুর্নামের ক্ষেত্রে মাতাকেও ছাড় দেয়নি বৌদ্ধধর্মীয় শাস্ত্র। আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করবো ৬১ নম্বর জাতক, যাকে অশাতমন্ত্র** জাতক বলা হয়। এই জাতকের বর্তমান বস্তুতে বলা হয়, গৃহকর্মে উৎসাহী ব্রাহ্মণ যুবককে তার পিতামাতা পুনর্বার গুরুর নিকট পাঠায় নারীচরিত্রের দোষ অনুধাবন করে সংসার-বৈরাগ্য লাভের উদ্দেশে। মাতাপিতার পরামর্শে সে গুরুর নিকট অশাতমন্ত্র দীক্ষায় প্রত্যাশী হয়। অশাতমন্ত্র বলতে সহজ ভাবে বোঝানো হয় অমঙ্গল বিষয়ে সচেতনতার বিদ্যা, আর নারীরাই হল এই বিদ্যার কেন্দ্র অর্থাৎ অমঙ্গলের মূল।

গুরুর বৃদ্ধ মাতা জীবিত ছিল এবং গুরুই তার সেবা করতো। এজন্য লোকে গুরুকে ঘৃণা করত, কিন্তু মাতৃসেবা কেন ঘৃণ্য বিষয় হবে, তার কোনো ব্যাখ্যা জাতকটিতে নেই। ব্রাহ্মণপুত্রকে গুরু তার মাতার সেবায় নিয়োগ করলেন। ব্রাহ্মণপুত্র সেবা করতে করতে গুরুর মাতার প্রশংসা করত এই ভাবে: "জরাগ্রস্ত হইয়াও আপনার কি অপরূপ দেহকান্তি, না জানি যৌবনকালে আপনি কীদৃশী রুপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন।" এভাবে কিছুদিন রুপকীর্তন করার ফলে বৃদ্ধার মনে হল ব্রাহ্মণপুত্র প্রণয়প্রত্যাশী।

বৃদ্ধ মাতা ব্রাহ্মণপুত্রকে প্রণয়ে উৎসাহিত করলে ব্রাহ্মণপুত্র তার গুরুভীতির কথা জানায়। বৃদ্ধা মাতা তখন তার পুত্র অর্থাৎ গুরুকে হত্যা করার জন্য ব্রাহ্মণপুত্রকে উৎসাহিত করে। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণপুত্র স্বীকৃত না হওয়ায় নিজেই কৌশলে নিজ পুত্রকে হত্যা করতে আগ্রহী হয়। জাতকের ভাষায় – " স্ত্রীজাতি এমনি অসতী, হেয়া ও নীচাশয়া যে এত অধিকবয়স্কা বৃদ্ধাও কামভাবের বশবর্তী হইয়া বোধিসত্ত্বের ন্যায় ভক্তিশীল ও শুশ্রূষাপরায়ণ পুত্রের প্রাণসংহারের জন্য প্রস্তুত হইল।"

কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্র গুরুকে তার মায়ের সব কিছু বলে দেয়। ব্রাহ্মণপুত্রের প্রণয় না পেয়েই লজ্জায় অপমানে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় বৃদ্ধা মাতা। বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে গুরু তার বিদ্যার্থীকে জানায়ঃ 'বৎস, স্ত্রীজাতি মানেই অসতী এবং ইহাই অশাতমন্ত্রের সারকথা। তোমার পরিবার তোমায় আমার কাছে পাঠিয়েছে ইহার কারণ এই যে তুমি স্ত্রীজাতির দোষ জানিতে পারিবে। আমার মাতার চরিত্রে কি দোষ ছিল তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পারিলে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে রমণীরা কীদৃশ অসতী হইতে পারে।' এরপর বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণপুত্র নারী বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার পর সংসারে ফিরে না গিয়ে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করে। গুরু দ্বারা অশাতমন্ত্র প্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ পুত্রের মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে নীতিগাথা:

** অশাত = অমঙ্গল।

নারীর চরিত্র, হায়, কে বুঝিতে পারে?
অসতী প্রগলভা বলি জানি সবাকারে।
কামিনী কামাগ্নি-তাপে যবে দগ্ধ হয়
উচ্চে নীচে সমভাবে বিতরে প্রণয়।
খাদ্যের বিচার নাই আগুনের ঠাঁই
নারীপ্রেমে পাত্রাপাত্র-ভেদজ্ঞান নাই।
অতএব ত্যাজি হেন জঘন্য সংসার
সন্ন্যাসী হইব এই সংকল্প আমার।

অন্ধভূত জাতক

এবার আমরা আলোচনা করবো বৌদ্ধশাস্ত্রের ৬২ নম্বর জাতক, যার নাম অন্ধভূত জাতক। এই জাতকের বর্তমান বস্তুতে শাস্তা এক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে বলেন, "রমণীরা নিতান্তই অরক্ষণীয়া। পুরাকালে জনৈক পণ্ডিত কোন রমণীকে তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সময়াবধি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াও সৎপথে রাখিতে পারেন নাই।" এই জাতকের অতীতবস্তুতে আমরা জানতে পাই, বোধিসত্ত্ব ছিলেন রাজা যিনি তার পুরোহিতের সাথে দ্যূতক্রিয়া করতেন। এই ক্রিয়ায় তিনি একটি মন্ত্র পাঠ করতেন এবং পুরোহিত প্রতিবারেই হেরে যেত। মন্ত্রটার গাথা হল নিম্নরূপ:

যাহার স্বভাব যেই, সেই মতে চলে সেই,
কি সাধ্য কাহার, করে প্রকৃতি লঙ্ঘন?
বনভূমি পায় যথা, তরুরাজি জন্মে তথা,
আঁকা বাঁকা পথে সদা নারীর গমন।
পাপাচার পরায়ণ জানিবে রমণীগণ,
স্বভাব তাদের এই, নাহিক সংশয়;
যখনই সুবিধা পায়, কুপথে ছুটিয়া যায়
ধর্ম্মে মতি তাহাদের কভু নাহি হয়।

প্রতিদিন হারতে হারতে পুরোহিত বুঝতে পারল চরিত্র দোষ হয়নি এমন একজন নারী সংগ্রহ করতে পারলেই এই মন্ত্রের ক্ষমতা হারিয়ে যাবে। এজন্য সে সদ্যভূমিষ্ঠ কন্যা সংগ্রহ করে লালন পালন করতে লাগল এবং মেয়েটি যৌবনে পদার্পণ করলে পুরোহিত তাকে নিজেই বিয়ে করল। পরে একদিন রাজার সঙ্গে দ্যূতক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়ে পুরোহিত জিতে গেল। রাজা মন্ত্র পাঠ করলেও জিততে না পেরে বুঝল যে, পুরোহিতের গৃহে নিশ্চয়ই এমন কোন নারী আছে, যে পতি ব্যতীত অপর কোনো পুরুষে আসক্ত হয়নি। রাজার অনুমান সত্য হওয়ায় নারীটিকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে এক ধূর্তের মাধ্যমে চরিত্রভ্রষ্ট করল রাজা।

এরপর আবার দ্যূতক্রিয়ায় হেরে গেল পুরোহিত। তখন পুরোহিত বুঝতে পারল যে, ইতিমধ্যেই তার রমণীর পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। তখন রাজা বলেন "রমণীদিগকে নিজের কুক্ষির অভ্যন্তরে রাখিয়া নিয়ত সঙ্গে লইয়া বেড়াইলেও রক্ষা করা অসম্ভব। জগতে বোধহয় এমন স্ত্রী নাই যে স্বামীভিন্ন পুরুষান্তরের সংসর্গে আসে নাই।" রাজার বক্তব্য জানার পর পুরোহিত তার স্ত্রীকে প্রশ্ন করে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না, বরং নারীটি তার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত হয়। এদিকে পরিচারিকার মাধ্যমে

নারীটি পূর্বেই ধূর্তকে সংবাদ প্রদান করে এবং অগ্নিতে প্রবেশের পূর্বেই ধূর্ত নারীটির হাত ধরে ফেলে। নারীটি তখন ঝাঁপ না দিয়ে দাবী করে যে, এই ধরার মাধ্যমেই তার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বুঝতে পারে সবই নারীটির কৌশল এবং এজন্য সে নারীটিকে প্রহারের পরে বিতাড়িত করে। জাতকের শেষাংশে রাজারুপী বোধিসত্ত্বের নারী সম্পর্কিত নির্দেশনা উচ্চারিত হয় এভাবে:

নারীর স্বভাব এই দেখিবারে পাই,
চৌরী, বহুবুদ্ধি তারা, সত্যজ্ঞান নাই।
জলমধ্যে যাতায়াত করে মৎস্যগণ
কে পারে তাদের পথ করিতে দর্শন?
রমণী-হৃদয়-ভাব তেমতি দুর্জ্ঞেয়
মিথ্যা তারা সত্য করে, সত্য করে হেয়।
নিত্য নব তৃণ খোঁজে গাভীগণ যথা
কামিনী নূতন বর নিত্য চায় তথা।
ভুজঙ্গিনী খলতায় মানে পরাজয়,
চাপল্যে বালুকা ভয়ে দূরে সরে যায়।
পুরুষ-চরিত্র জ্ঞানে অদ্বিতীয়া নারী,
নখদর্পণেতে আছে সংসার তাহারি।

দুরাজান জাতক

এখন আমরা আলোচনা করবো বৌদ্ধশাস্ত্রের ৬৪ নম্বর জাতক, যার নাম দুরাজান[††] জাতক। এই জাতকে আচার্যরূপী শাস্তা জানালেন: "রমণীগণ যেদিন দুষ্কার্য করে সেদিন স্বামীর অনুবর্তন করে, দাসীর ন্যায় বিনীত হইয়া চলে; কিন্তু যেদিন দুষ্কার্য করে না, সেদিন তাহারা মদোদ্ধতা হইয়া স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। দুঃশীলা ও পাপপরায়ণা রমণীদের এইরূপই স্বভাব।" এরপর তিনি ছাত্রের উদ্দেশ্যে একটি গাথা উচ্চারণ করেন:

ভাল যদি বাসে নারী,
হইও না হৃষ্ট তায়,
যদি ভালো নাহি বাসে,
তাতেই কি আসা যায়?
নারীর চরিত্র বুঝে
হেন সাধ্য আছে কার?
বারিমাঝে চরে মাছ
কে দেখিবে পথ তার?

[††] দুরাজান = দুর্জ্ঞেয়।

অনাভিরতি জাতক

এর ঠিক পরের জাতকটি অর্থাৎ ৬৫ নম্বর জাতক হল অনাভিরতি জাতক। এখানে বৌদ্ধরূপী শাস্তা বলেন, স্ত্রীজাতি চরিত্রহীন হবে, এ আর এমন কি? এটা দেখে বুদ্ধিমানের রাগ করতে নেই। উপদেশটি হল এরকম:

নদী, রাজপথ, পানের আগার,
উৎস, সভাস্থল আর,
এই পঞ্চস্থানে অবাধে সকলে
ভুঞ্জে সম অধিকার।
তেমতি রমণী ভোগ্যা সকলের,
কুপথে তাহার মন,
চরিত্রস্খলন দেখিলে তাহার
রোষে না পণ্ডিত জন।

পর্ণিক জাতক

আমাদের এখন আলোচনার বিষয় ১০২ নম্বর জাতক। পর্ণিক[‡‡] জাতক নামে এই জাতকের বর্তমানবস্তুতে আমরা দেখতে পাই নিজের মেয়ের যৌনশুদ্ধতা নিয়ে উদ্বিগ্ন পিতা। তাই গোত্রান্তরিত করার পূর্বে মেয়ে প্রকৃত কুমারী কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। কন্যাকে নিয়ে বনপ্রান্তে গিয়ে হাত চেপে ধরে পিতা, এতে কন্যা আতঙ্কিত হয়। প্রশ্নোত্তরে পিতা জানতে পারে, কন্যা এখনো কুমারী ধর্ম রক্ষা করেছে। এরপর কন্যাকে নিশ্চিন্তভাবে পাত্রস্থ করার ভরসা পায় পিতা।

---

‡‡ পর্ণিক = শাকপাতা, আনাজপাতি উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা।

সেগগু জাতক

পিতা দ্বারা কন্যার সতীত্ব পরীক্ষার আরও উদাহরণ পাওয়া যায় জাতকগুলোতে। ১০২ নম্বর জাতকের মতো প্রায় একই ধরণের কাহিনী আমরা দেখতে পাই ২১৭ নম্বর জাতকে। এই জাতকের নাম সেগগু জাতক। জাতকটির অতীতবস্তুতে পিতা তার কন্যার চরিত্র পরীক্ষাকালে জানায়:

সর্বত্র দেখিতে পাই নরনারীগণ
ইচ্ছামতো হয় ভোগবিলাসে মগন।
তুমি কি লো সেগগু একা এতবড় সতী
না জান বৃষলীধর্ম[§§] হইয়া যুবতী?
বনে ধরিয়াছি হাত, কান্দ সে কারণ,
রয়েছ কুমারী যেন সারাটি জীবন।

কন্যাটি এ কথা শুনে তার সতীত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে বলে পিতাকে এই ভাবে:

যে জন রক্ষার কর্তা সেই পিতা মম
বনমাঝে দুঃখ দেন অতীব বিষম।
বনমাঝে কেবা মোর পরিত্রাতা হবে?
রক্ষক ভক্ষক হয় কে শুনেছে কবে?

---

§§ বৃষলী = ব্যভিচারিণী

বন্ধনমোক্ষ জাতক

প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থে কন্যার সতীত্ব পরীক্ষা করতে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের ধর্মগ্রন্থও এমন কোন ব্যতিক্রম নয়। তবে ঐ সব গ্রন্থে সতীত্ব প্রমাণ করতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাকে দেখা গেছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে পুরুষতন্ত্র এতোই প্রকট যে, এ ক্ষেত্রে কন্যার সতীত্ব পরীক্ষা করে স্বয়ং তার পিতা। সতীত্ব পরীক্ষার পাশাপাশি নারীর চরিত্র পরীক্ষার দিকে আবার মনোনিবেশ করলে এই সংক্রান্ত একটি জাতক খুব বেশী চোখে পড়ে, তা হলো ১২০ নম্বর জাতক যার নাম বন্ধনমোক্ষ জাতক।

এই জাতকের অতীতবস্তুতে বারাণসীরাজ তার অন্তঃপুরে ষোড়শ সহস্র নর্তকী থাকলেও শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করতো, কিন্তু তার রাণী ছিল ব্যভিচারিণী। রাজা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে গেলে রাণী ৬৪ জন দূতের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, কিন্তু সর্বশেষ রাজপুরোহিতরূপী বোধিসত্ত্ব রাণীর আহ্বানে সারা দেয় না। তাতে রাণী রেগে গিয়ে বোধিসত্ত্বের ওপরেই কাম প্রস্তাবের অভিযোগ আনে, তবে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, বোধিসত্ত্ব নির্দোষ। তখন রাজা বোধিসত্ত্ব বাদে বাকি ৬৪ জনকে প্রাণদণ্ডাদেশ দিতে চাইলে বোধিসত্ত্ব মহারাজকে বলেন: “মহারাজ ইহাদেরই বা দোষ কী? ইহারা দেবীর আদেশমত তাঁহারই অভিলাষ পূরণ করিয়াছে। স্ত্রীজাতির দুষ্প্রবৃত্তি দুর্দমনীয়া, যাহা জাতিস্বভাব তাহা দুরতিক্রম।”

বোধিসত্ত্ব

ওপরের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করার সময় বোধিসত্ত্ব কথাটা চলে এসেছে। বোধিসত্ত্ব কথাটা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন মনে করছি। বোধিসত্ত্ব শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, বুদ্ধত্ব (শাশ্বত জ্ঞান) প্রাপ্তিই যাঁর ভবিতব্য অর্থাৎ যিনি বোধিলাভ করার জন্যই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখায় বোধিসত্ত্বের বহুবিধ ব্যাখ্যা থাকলেও মহাযান বৌদ্ধধর্ম মতে বোধিসত্ত্ব হলেন তিনিই, যিনি জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং নির্বাণলাভ থেকে বিরত থাকেন এবং বিশ্বের সকল জীবের মুক্তিলাভের উপায় করেন।

ত্রিপিটকে পালি ভাষায় বোধিসত্ত্ব শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেছিলেন শাক্যমুনি বুদ্ধ। বোধিসত্ত্ব শব্দটি দ্বারা তিনি তাঁর পূর্বজন্মের অবস্থা থেকে বোধিলাভ করার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত জীবনকে বুঝিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনী ব্যক্ত করতে গিয়ে গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ এখান থেকে অনুধাবন করা যায় যে, বোধিসত্ত্ব হলেন তিনিই, যাঁর জীবনের একমাত্র ব্রতই হল বোধিলাভ।

বুদ্ধের বোধিসত্ত্বাবস্থার এই সকল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে জাতকে। মহাযান বৌদ্ধধর্মানুসারে একজন বোধিসত্ত্ব হলেন তিনিই, যিনি বুদ্ধত্বলাভের প্রায় প্রতিটি স্তরই উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি স্বয়ং পরম জ্ঞান লাভ করেছেন এবং সেই শাশ্বত বোধের আলোকে প্রতিটি জীবকে আলোকিত করছেন ও তাদের রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করেছেন।

রাধা জাতক

আবার আসি নারী প্রসঙ্গে – কোনো বিশেষ নারী নয়, নির্বিশেষে সকল নারীই ব্যভিচারিণী, নাহ্‌, এটা আমার কথা নয়, বলেছেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব যার সম্পর্কে এতো সময় বর্ণনা করলাম। সকল নারীই যে ব্যভিচারিণী এই বিষয়ে আলোচনা করব ১৪৫ নম্বর জাতক, যার নাম রাধা জাতক। এই জাতকে বোধিসত্ত্ব আর তাঁর ভাই রাধার পালক মাতা এক ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী। রাধা তাকে পরপুরুষ সংসর্গে বাধা দিতে গেলে বোধিসত্ত্ব বলেন, “ভাই তুমি বালক, কিছু বুঝ না, তাই এরূপ বলিতেছ। রমণীদের সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না।” এরপর বোধিসত্ত্ব নিম্নোক্ত গাথাটি বলেন:

রাধা তুমি নাহি জান আরও কতো জন
না হইতে অর্ধ রাত্রি দিবে দর্শন!
নিতান্ত অবোধ তুমি, তাহারই কারণ
বলিলে করিতে মোরে অসাধ্য সাধন।
কামিনীর কুপ্রবৃত্তি, পতিভক্তি বিনা
দমিতে যে পারে কেহ, আমি তো দেখিনা।
কিন্তু সেই পতিভক্তি, হায় হায় হায়
মাতার হৃদয়ে কিছু নাহি দেখা যায়।

মৃদুপাণি জাতক

নারীনিয়ন্ত্রণ পুরুষতন্ত্রের জন্য অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ। বোধিসত্ত্বের প্রতিটি উপদেশের মধ্যে নারীকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকট ভাবে দেখা যায়। কিন্তু তারপরও 'নারী হলো দুর্নিবার, তাকে কখনোই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না' এই উপদেশও দিয়েছেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব।

মৃদুপাণি জাতকের (২৬২ নম্বর জাতক) বর্তমানবস্তুতে কোনো এক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করে বোধিসত্ত্ব বলেন, "রমণীরা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে রক্ষা করা অসম্ভব। পুরাকালে পণ্ডিতজনেও নিজের কন্যা রক্ষা করিতে পারেন নাই। পিতা কন্যার হাত ধরিয়া ছিলেন, তথাপি সেই কন্যা প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে পুরুষান্তরের সহিত পলায়ন করিয়াছিল।"

এই জাতকের অতীতবস্তুতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব পুরাকালে বারাণসীর রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তার কন্যা ও ভাগিনেয় পরস্পর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। পুরুষের প্রেমে নারীটি এতোই উদ্বেলিত ছিল যে, সংকেতস্থলে মিলনের জন্য কৌশলে পলায়ন করে। এজন্যই বোধিসত্ত্ব বলেছেন, 'হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলেও কেহ রমণীদিগকে রক্ষা করতে পারে না। রমণীরা এমনই অরক্ষণীয়া।' এ বিষয়ে বোধিসত্ত্ব যে গাথাটি বলেন তা হলো:

কে পারে তুষিতে বল রমণীর মন
সাবধানে বলি সদা মধুর বচন!
নদীতে ঢালিলে জল কে কবে লভিবে ফল?
পুরাইতে গর্ভ তার শক্তি কারো নাই,
ললনার বাসনার অন্ত নাহি পাই।
নিয়ত নরক পথে নারীর গমন
দূর হতে সাধু তারে করে বিসর্জন।
তুষিতে নারীর মন যে করে যতন,
ভালোবাসে, দেয় তারে যত পারে ধন,
ইহা মূত্র নাশ তার যেন নারী দুর্নিবার,
ইন্ধনে লভিয়া পুষ্টি তাহাই যেমন
মুহূর্তের মধ্যে নাশ করে হুতাশন,
তেমনি নারীগণে যেবা ভালোবাসে
তাহাকেই পিশাচীরা অচিরে বিনাশে।

সমুদ্গ জাতক

প্রতিটা ধর্মেই কমবেশী উদ্ভট গালগল্প রয়েছে, অনেকের কাছে যুক্তিবাদী ধর্ম হিসেবে পরিচিত বৌদ্ধধর্মেও আমি তার ব্যতিক্রম পেলাম না। যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয় নারীর প্রতি বৌদ্ধশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি, তাই উদ্ভট গল্পে না যেয়ে নারী প্রসঙ্গেই আসি, যদিও সেখানেও আমরা উদ্ভট গালগল্প পাবো। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি, সম্ভবত সেজন্যই এই ধরনের অযৌক্তিক গল্পগুলো বৌদ্ধশাস্ত্রের পাতায় স্থান করে নিয়েছে।

এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব সমুদ্গ জাতক নিয়ে। ৪৩৬ নম্বর এই জাতকের বর্তমানবস্তুতে বোধিসত্ত্ব কোনো এক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর উদ্দেশে বলেন, "দেখ, তুমি রমণী লাভের জন্য এত ব্যগ্র কেন? রমণীরা পাপাসক্তা ও অকৃতজ্ঞা। পূর্বে একটা দৈত্য কোন রমণীকে গিলিয়া নিজের কুক্ষির মধ্যে রাখিয়া বিচরণ করিত, তথাপি সে উহার চরিত্র রক্ষা করিতে ও উহাকে একমাত্র পুরুষে আসক্ত রাখিতে পারে নাই। সে যাহা না পারিয়াছে, তুমি তাহা পারিবে কেন?"

এই জাতকের অতীতবস্তুতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যা নিয়ে হিমালয়ে বসবাস করছিলেন। সে সময় কোনো এক দানব এক কুলকন্যাকে আহারের নিমিত্তে ধরে আনলেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজ গুহায় দাম্পত্যজীবন শুরু করে। কিন্তু দানব কন্যাটির চরিত্রের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। এজন্য সে নারীটিকে একটি বাক্সের মধ্যে বন্দি করে নিজেরই উদরে গোপন রাখত।

একদা সে বাক্সটি খুলে নারীটিকে 'কিছুকালের জন্য গায়ে বাতাস লাগাও' বলে নিজে স্নানের জন্য গেলে নারীটি কৌশলে বায়ুপুত্রকে বাক্সের ভিতর গ্রহণ করে নেয় এবং সেখানে উভয়ে কামলীলায় মত্ত হয়। বাক্সসহ দানবটি বোধিসত্ত্বের নিকট ধর্মকথা শুনতে গেলে তিনি তিনজনকে স্বাগতম জানান। তিনজন শুনে দানব অবাক হলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে সবকিছু খুলে বলেন। বোধিসত্ত্বের দেওয়া উপদেশে দানবের যে উপলব্ধি হয় তার মধ্যে অন্যতম:

- ছলনাময়ী নারীদের চরিত্রে কখনোই বিশ্বাস করতে নেই।
- যত সাবধানেই নারীকে রক্ষা করো না কেন, তারা বহুগামী হবেই।
- নরকের পথে সব সময় নারীদের গমন।
- রমণী ত্যাগ করা পুরুষই একমাত্র প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে।
- রমণী ত্যাগ করে ধর্ম করাই মঙ্গল।

- নারী সংসর্গ দুর্গতি আনয়ন করে।

নিম্নে বোধিসত্ত্বের স্তুতি করে দানবের বলা গাথা প্রদান করা হল:

যত সাবধানে কেন করি না রক্ষণ,
বহু ছল জানে নারী, বিশ্বাস কখন
চরিত্রে তাহার আর করা নাহি যায়।
নরকের পথে নারী প্রপাতের প্রায়।
রমণীসংসর্গ ত্যাজি যে জন বিচরে,
বীত শোক হয়ে সেই সুখলাভ করে।
রমণীসংসর্গ ত্যাজি ধর্ম অনুষ্ঠান–
ইহাই বিজ্ঞের পক্ষে মঙ্গল নিদান।
এই সুখ তাহাদের প্রার্থনীয় অতি।
রমণী সংসর্গে ঘটে অশেষ দুর্গতি।

সুজাতা জাতক

পুরুষ স্ত্রীকে চায় সর্বগুণ সমন্বিত দাসীর রূপে। তারা সংসারে কর্মঠ যন্ত্রবিশেষ হবে, কিন্তু কোন কণ্ঠস্বর থাকবে না। এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো বৌদ্ধ শাস্ত্রের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের জাতক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সুজাতা জাতক নিয়ে। জাতক কাহিনীর ২৬৯ নম্বর এই জাতকের অতীতবস্তুতে জানা যায় বিশাখার কনিষ্ঠা ভগিনী সুজাতা স্বামীগৃহে যাবার সময় অনেক দাসদাসী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, এ জন্য তার মধ্যে অহংকার ছিল। সে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি কাউকেই গ্রাহ্য করতো না, বাড়ির দাসদাসীকে তর্জন গর্জন এমনকি প্রহার পর্যন্ত করত। একদিন বোধিসত্ত্ব (বোধিসত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য) ঐ বাড়িতে আহার করতে এসে সুজাতার স্বভাব জানতে পেরে তাকে সাত প্রকার ভার্য্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন এবং তার নিজের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য বলেন।

১. বধকা নারী: এই প্রকারের নারীরা অর্থ অপচয়কারিণী, দুষ্টমতি, দুশ্চরিত্রা এবং স্বামীকে ঘৃণা করে।
২. চৌরী নারী: এই প্রকারের নারীরা নিজের জন্য স্বামীর সম্পত্তি হরণ করে, কিন্তু স্বামীর কষ্টের কথা ভাবে না।
৩. আর্য্যা/প্রচণ্ডা নারী: এরা অলস, পেটুক, দুর্মুখ, নির্দয়, পীড়নকারিণী।

বাকি চার প্রকার নারীই ভদ্র এবং এরাই সমাজের কাম্য। সতিসাধ্বী নারীদের প্রকৃতি সম্পর্কে বোধিসত্ত্বের মতামতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- সব সময় স্ত্রী পতির যত্ন করবে।
- স্ত্রী তার পতির সেবা শুশ্রুষা করবে।
- স্বামীকে সব সময় সম্মান করবে
- স্ত্রী সর্বদা তার পতির বশবর্তী হয়ে থাকবে।
- লজ্জায় মুখ থেকে কথা বের হবে না।
- নির্যাতনেও কখনোই অসন্তোষ প্রকাশ করবে না।
- স্বামীর ভয়ে সব সময় কম্পমান থাকবে।

এরাই হচ্ছে বোধিসত্ত্বের মতে সতী নারী। যারা সংসারে সুখ নিয়ে আসতে পারে। বোধিসত্ত্বের নীতিগাথাটি নিম্নে দেয়া হল যার মাধ্যমে সতী নারী সম্পর্কে আপনিও স্পষ্ট ধারণা পাবেন:

চিত্ত যার সর্বদা হিতব্রতপরায়ণ
পতির সম্পত্তি যত্নে করে সংরক্ষণ
যেরূপ যতনে মাতা পুত্রের লালনে রতা
পতির শুশ্রুষা তথা করে অনুক্ষণ

মাতৃসমা হেন ভার্য্যা বলে সর্বজন।
কনিষ্ঠা ভগিনী যথা জ্যেষ্ঠ সহোদরে
নিয়ত সম্মান করে প্রফুল্ল অন্তরে
সেইরূপ যে গৃহিণী পতির বশবর্তিনী,
লজ্জাবশে যার মুখে না সরে বচন,
সে ভার্য্যা ভগিনীসমা বলে সর্বজন।
বিলম্বে সখার সঙ্গে ঘটিলে মিলন
সখী যথা সুখী তার নেহারি বদন
হেরিলে পতির মুখ তেমতি যে পায় সুখ
সুজাতা, সুশীলা, সাধ্বী রমণীরতন
হেন ভার্য্যা সখীসমা বলে সর্বজন।
উৎপীড়নে অসন্তোষ না উপজে যার,
দণ্ডভয়ে কম্পমান সদা কলেবর,
সুশীলা তিতিক্ষাবতী, ক্রোধহীনা যেন সতী,
তুষিতে পতির মন রত অনুক্ষণ,
দাসী সেই ভার্য্যা ইহা বলে সর্বজন।

বোধিসত্ত্ব উপরের গাথাটি বলে সুজাতাকে প্রশ্ন করলেন, সে কেমন ভার্য্যা হতে চায়? সুজাতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাসী হতেই চেয়েছে। প্রতিটি ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মেও সেই দাসী হওয়াই নারীর নিয়তি!

সম্বুলা জাতক

স্বামী যে তার স্ত্রীকে অবহেলা করবে এটাই স্বাভাবিক, স্ত্রীর সবচেয়ে বড় সাধনা হচ্ছে স্বামীর মন রক্ষা করা। অবশ্যই স্বামীর অধিকার আছে তার স্ত্রীকে সন্দেহ করার, কিন্তু স্বামীর সেবা করাই স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য, পতিদেবতাকে সন্দেহ করার কোনো অধিকার স্ত্রীর নেই।

না, এগুলো আমার কথা নয়, ধর্মের কথা। কমবেশি এই ধরণের নীতিকথা আমাদের প্রতিটা ধর্মই শেখায়। বৌদ্ধধর্মও তার ব্যতিক্রম নয়।

বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকের জাতকে এই ধরণের নির্দেশনা রয়েছে প্রচুর। এখন আমরা আলোচনা করবো ৫১৯ নম্বর জাতক, সম্বুলা জাতক নিয়ে।

এই জাতকের অতীতবস্তুতে বলা হয়েছে, বারাণসীরাজ স্বস্তিসেনের সম্বুলা নামে এক স্ত্রী ছিলেন যিনি অতীব সৌন্দর্যবতী, রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া ছিলেন। স্বস্তিসেন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হলে এবং চিকিৎসায় প্রতিকার না পেলে গোপনে বনবাসে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় সম্বুলা তার সেবাশুশ্রূষার জন্য সহযাত্রী হন। একদিন একা একা বনের মধ্যে দিয়ে সম্বুলার চলন দেখে এক দানব আকৃষ্ট হয়। দানব তার সতীত্ব নষ্ট করতে চাইলে তখন দেবরাজ দ্রুত নেমে এসে ঘোষণা করেন:

সুপণ্ডিতা, জিতেন্দ্রিয়া, ইনি অতি যশস্বিনী
অগ্নিসমা, উগ্রতেজা, রমণীর শিরোমণি।
এমন সতীর মাংস করিবি যদি ভক্ষণ
করিব সপ্তধা, দৈত্য, শির তোর বিদারণ।
এ পতিব্রতার দেহ স্পর্শে তোর কলুষিত
করিস না, ছাড় শীঘ্র, চাস যদি নিজ হিত।

এরপর দানব সম্বুলাকে ছেড়ে দিল, সেখান থেকে কোন রকমে বেঁচে গৃহে ফিরে স্বামীকে না দেখতে পেয়ে সম্বুলা কাঁদতে শুরু করেন। পরে স্বামী স্বস্তিসেন এলে নিজের বিলম্বের প্রকৃত কারণ বলেন সম্বুলা। কিন্তু এই ব্যাখ্যা স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। স্বামী স্বস্তিসেন বলেন:

রমণীজাতির বুদ্ধি নানা দিকে খেলে,
চৌরী তারা, সত্য সদা দুই পায়ে ঠেলে।
উদকে মৎস্যের গতি বুঝা নাহি যায়,
সেইরুপ স্ত্রী-চরিত্র বুঝা বড় দায়।

স্বস্তিসেনের এ প্রকার অবিশ্বাসের পরেও সম্বুলা স্বামীসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। সে আপন সত্যবলে স্বামীসেবা করে যাবার প্রতিজ্ঞা করে। সে নিজের সতীত্ব প্রমাণের জন্য স্বস্তিসেনের শরীরে জল ঢেলে দিলে স্বস্তিসেন সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু এত কিছুর পরও স্বস্তিসেন তাঁর স্ত্রীকে অবহেলাই করে গেছেন। স্বামীর অবহেলাই যেন নারীর নিয়তি!

কুশ জাতক

পুত্রসন্তান জন্ম দেয়াই নারীর অভীষ্ট লক্ষ্য। কারণ সংসারে স্থায়ী হতে হলে পুত্রসন্তানের মাতা হিসেবেই নারীর গুরুত্ব সর্বাধিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীও নিজে গর্ববোধ করে, যখন সে পুত্রসন্তানের জন্মদান করে। সমাজে পুত্রের মাতা হিসেবে একটু হলেও মূল্যায়ন পায় নারীরা। বিশেষ করে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে পুত্রসন্তানের মাতা হিসেবে নারীকে একটু বেশী মূল্যায়ন করার অনেক কাহিনী শোনা যায়।

এখন আমরা আলোচনা করবো বৌদ্ধশাস্ত্রের ত্রিপিটকের অন্তর্গত ৫৩১ নম্বর জাতক নিয়ে। কুশ জাতক নামে এই জাতক থেকে বেশ কিছু সত্য উদ্ধার হয়। এই জাতক থেকে জানা যায়, কুশাবতী নগরে ইক্ষাকু নামে রাজার ষোল হাজার অন্তঃপুরচারিণী (স্ত্রী) ছিল। এদের মধ্যে শীলবতী নামে এক নারী অগ্রমহিষী (প্রধানা স্ত্রী) ছিলেন। কিন্তু রাজার এত স্ত্রী সত্ত্বেও কোনো পুত্র ছিল না, এতে প্রজারা নিজেরাই বিধান দিতে এগিয়ে আসে।

প্রজারা জানায়, রাজভবনের কিছু নারীকে নগরে উন্মুক্ত করে দেয়া হোক, যাতে তারা অবাধে যৌনমিলনের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে পুত্রসন্তান লাভ করতে পারে। প্রজাদের এই কথামতো রাজভবনের কিছু সংখ্যক রাণীকে সাতদিন পর পর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে নগরে উন্মুক্ত করা হত। নারীরা নগরে অবাধে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হত, রাজভবনে ফিরে আসার পর রাজা তাদের পুত্র গর্ভধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, কিন্তু তারা কেউই গর্ভবতী হয়নি।

এরপর প্রজারা আবার অভিযোগ করলে রাজা জানান যে, অনেক নারীকে নগরে পুত্রসন্তান লাভের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তারা কেউ পুত্রবতী না হলে আমার কী করার আছে? তখন বিজ্ঞ প্রজারা বিধান দিল, এই স্ত্রীলোকেরা পুণ্যবতী নয়, তাই পুত্র লাভের অযোগ্যা। এখনো পুণ্যবতী অগ্রমহিষী (প্রধানা স্ত্রী) শীলবতী বাকি রয়েছেন। তাঁকেও নগরে পুরুষ দ্বারা পুত্রসন্তানে গর্ভবতী করার জন্য প্রেরণ করা হোক।

অবশেষে প্রজাদের কথা মেনে নিয়ে রাজা অগ্রমহিষীকে নগরে যৌনসঙ্গমের জন্য পাঠাতে রাজি হন। তখন কেউ যেন শীলবতীর শীলতেজ ভঙ্গ করতে না পারে, সেজন্য দেবরাজ ব্রাহ্মণ বেশে অগ্রমহিষীকে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণের নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করলে তিনি শীলবতীকে দুই ধরণের পুত্রের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করতে বললেন, প্রথমত প্রজ্ঞাবান কিন্তু রূপহীন, দ্বিতীয়ত রূপবান কিন্তু প্রজ্ঞাহীন। শীলবতী প্রজ্ঞাবান পুত্রই কামনা করলেন। তখন দেবরাজ শীলবতীকে শয্যায় শায়িত করে অলৌকিক কৌশলে অঙ্গুলি দ্বারা নাভি স্পর্শ করে বোধিসত্ত্বকে রাণীর গর্ভে রোপণ করে গর্ভবতী করালেন। এভাবেই পুত্রসন্তান লাভ করে শীলবতীর মর্যাদা বেড়ে গেলো।

প্রত্যেকটা ধর্মই নিজেকে বিজ্ঞানময় দাবি করলেও ভুয়া অলৌকিকতায় ভরপুর। অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী ধর্ম হিসেবে পরিচিত বৌদ্ধধর্মেও সেই হাস্যকর অলৌকিকতাই পাই আমরা। একবার চিন্তা করে দেখুন, আঙুল দিয়ে গর্ভবতী করা, তাও আবার নাভিতে! উপরের জাতক কাহিনী থেকে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, যৌনতার ক্ষেত্রেও নারীর নিজস্ব কোনো পছন্দ থাকবে না, প্রয়োজনে পিতৃতন্ত্র যেখানে যৌনসংসর্গের জন্য পাঠাবে, সেখানেই তাকে যেতে হবে।

উৎসঙ্গ জাতক

স্বামীই হচ্ছে নারীর অলংকার, নারীর আচ্ছাদন। যে নারীর স্বামী নেই, সে নগ্ন। বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটক আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। তৎকালীন সমাজের প্রবল পিতৃতন্ত্রের কাছে অসহায় প্রতিটি নারী। পুরুষ নারীর আশ্রয়দাতা, নারীর অন্ন-বস্ত্রসহ সবকিছু পুরুষের দানের ওপর নির্ভর করে। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাবলয়ে স্বামী/পিতা/ভ্রাতা বা পুত্রের দয়ার ওপর একজন নারী বেচে থাকে।

স্বামী যে নারীর আচ্ছাদন তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকের ৬৭ নম্বর জাতকে। এই জাতকের নাম উৎসঙ্গ জাতক। এই জাতকের বর্তমানবস্তুতে জানা যায়, ডাকাত হিসেবে সন্দেহ করে ভুল করে রাজা তিন চাষীকে রাজদরবারে ধরে আনেন। তিন চাষীর মধ্যে একজনার স্ত্রী খবর পেয়ে রাজদরবারে ছুটে আসে। সে এসে রাজার কাছে আবেদন করে: “আমায় আচ্ছাদন দান করুন, আমায় আচ্ছাদন দান করুন।”

রাজা তার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলে সে রাজাকে জানায়, “স্বামীই নারীদের প্রকৃত আচ্ছাদন। যাহার স্বামী নাই, সে সহস্র মুদ্রার আচ্ছাদন পরিধান করিলেও নগ্না।” (for a husband is a woman's real covering, and she that lacks a husband–even though she be clad in garments costing a thousand pieces–goes bare and naked indeed.) বিধবা নারীরা সবাই নগ্না এই দাবী করে সেই নারী বলে:

নগ্না জলহীনা নদী,
নগ্ন অরাজক দেশ
বিধবা রমণী নগ্না,
কি বলিব তাহার ক্লেশ?
ভ্রাতা বন্ধু দশজন
পারে কি রক্ষিতে তায়?
বিধবার দুঃখ হেরি
পাষাণ ফাটিয়া যায়।

রাজা জানতে পারেন যে, ঐ তিন কৃষক হলো নারীটির স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্র। নারী তাদের সকলের মুক্তি দাবি করল এবং তারা নির্দোষ বলেও দাবি করল। অবশেষে বিচারে তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয় এবং রাজা তাদের সবাইকে ছেড়ে দেন।

ওপরের জাতক কাহিনী থেকে নির্মম কিছু পিতৃতান্ত্রিক সত্য ফুটে ওঠে। পুরুষ ছাড়া নারীর কোনো গতি নেই – এই কুৎসিত মিথ্যেটা নারীর মুখ থেকে ফুটিয়ে তোলাই উৎসঙ্গ জাতকের অন্যতম কৃতিত্ব।

* সংক্ষেপে উৎসঙ্গ জাতক সম্পর্কে পড়ুন।

ন্যগ্রোধ জাতক

পুত্র সন্তান জন্মদান করাই নারীর একমাত্র লক্ষ্য। যদি সে পুত্রসন্তান জন্ম দিতে না পারে, তাহলে কোথাও সমাদর পাবে না। প্রকৃত অর্থে পুত্র না দিতে পারলে সেই নারীর জীবন বৃথা। তাই পুত্রসন্তান জন্মদান করতে সে যে কোনো ধরনের গর্হিত কাজ করতে পারে। সে অন্য পুরুষের সাথে পুত্র লাভের আশায় মিলিত হতে পারে, সে অন্যের পুত্রকে নিজের হিসেবে চালাতে পারে, এমনকি সে পুত্র চুরিও করতে পারে। কারণ তার সকল মান-মর্যাদা তো এই পুত্রের মধ্যেই নিহিত।

বৌদ্ধশাস্ত্রের জাতকগুলো পাঠ করলে নারী চরিত্রগুলোতে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা খুব ভালোভাবে চোখে পড়ে। এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকের ন্যগ্রোধ[***] জাতক নিয়ে। এটি জাতক কাহিনীর ৪৪৫ নম্বর জাতক। এই জাতকের অতীতবস্তুতে মগধরাজের পুত্রবধূর পুত্রসন্তান জন্মদানের ব্যর্থতা লোকসমাজে প্রচারিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বলে রাখি, অন্যান্য প্রাচীন ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মেও সন্তান না হবার জন্য শুধুমাত্র নারীকে দায়ী করার দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে, এটি তার মধ্যে একটি।

লোকসমাজে পুত্রসন্তান জন্মদানের ব্যর্থতা প্রচার হয়ে গেলে নারীটি বিপন্ন বোধ করে। এরপর সেই নারী কৌশলে গর্ভধারণের অভিনয় করে এবং তাকে এই কাজে সহযোগিতা করে তার দাসী। বধূটি নিজেকে গর্ভবতী বোঝাবার জন্য ঋতুকাল গোপন করে, নিজের হাত পা আঘাত করে ফুলিয়ে তোলে, খাবারে অরুচি প্রচার করে, গর্ভে প্রতিদিন ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখে এবং স্তনবৃন্তে কালি মাখিয়ে রাখে। এতে স্বামী ও সংসারে তার মান বৃদ্ধি পায় এবং তার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়।

বধূটি তার মাতৃগৃহে সন্তান প্রসবের নাম করে যাত্রা করে। পথে এক দরিদ্র সন্তানসম্ভবা মহিলা বটগাছের তলায় সন্তান প্রসব করে তাকে ফেলে রেখে চলে গেলে ওই নারী দাসীর সহায়তার সেই পুত্র চুরি করে আনে। তারপর সেই নবজাতককে নিয়ে নিজের শিশু বলে চালিয়ে দেয়। এভাবেই নারীটির মান বৃদ্ধি পায়। নারীটি তার জায়গা থেকে হয়তো নিরুপায় ছিল, পিতৃতান্ত্রিক চাপে এছাড়া তার ভিন্ন কিছু করার কথা মাথায় ছিল না।

* সংক্ষেপে ন্যগ্রোধ জাতক সম্পর্কে পড়ুন।

*** ন্যগ্রোধ = বটগাছ।

খুল্লহংস জাতক

বৌদ্ধ সাহিত্যে নারী প্রধানত সাধনার প্রতিবন্ধক, পুরুষ জীবনের সামগ্রিক সংকটের উৎস, কামস্বরূপা ও অরক্ষণীয়া। তবে সংসার জীবনে নারীর অনিবার্যতা সর্বাংশে অস্বীকার করতে পারেনি পুরুষ মনস্তত্ত্ব। অবশ্য ক্ষমতার সূত্র নিজের অনুকূলে রেখেই সুবিধামত নারীকে কামনা করেছে পুরুষ। তাই সংসার ও পুরুষের শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করেছে নারীর শুদ্ধতার ওপরে। এই শুদ্ধতা মূলত যৌনতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো ত্রিপিটকের সূত্রপিটকের খুদ্দক নিকয়ের অন্তর্গত জাতক কাহিনীর ৫৩৩ নম্বর জাতক নিয়ে। এই জাতকের নাম খুল্লহংস জাতক। এই জাতকের অতীতবস্তুতে বোধিসত্ত্ব এক রাজার জীবনের সুখ-শান্তি নিয়ে গল্প করছিলেন। এই গল্পের মধ্যেই প্রাসাঙ্গিকভাবে নারী চলে আসে। কী রকম স্ত্রী কাম্য হওয়া উচিত – তা বোধিসত্ত্বের বর্ণনায় আমরা ইঙ্গিত পেয়ে থাকি:

- অবশ্যই স্বামীর সমান বংশমর্যাদার স্ত্রী হতে হবে,
- গুণবতী স্ত্রী হতে হবে,
- সব সময় আজ্ঞা পালন করবে এমন স্ত্রী হওয়া চাই,
- সব সময় স্বামীর অনুবর্তী থাকবে,
- মুখে সর্বদা মধুর ভাষা থাকবে,
- বিশুদ্ধ চরিত্রের হতে হবে,
- অবশ্যই পুত্রবতী হতে হবে এবং
- অতি অবশ্যই রূপবতী হতে হবে।

এগুলোই হচ্ছে কাম্য স্ত্রীর গুণাবলী। একজন স্ত্রীর অবশ্যই এসব গুণ থাকতে হবে বলে বোধিসত্ত্ব আমাদের জানান। যদিও বোধিসত্ত্ব সব সময়ই জগতের কল্যাণের কথা ভেবে গৃহী না হয়ে ভিক্ষু হবার পরামর্শ দেন, কিন্তু তারপরও যেসব বৌদ্ধর পক্ষে ভিক্ষু হওয়া সম্ভব নয়, তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে ওপরোক্ত গুণাবলীর নারী অন্বেষণ করতে বলা হয়েছে। বোধিসত্ত্বের নীতিগাথার সেই অংশটুকু তুলে দেওয়া হলো, যেখানে কেমন স্ত্রী একজন পুরুষের কাম্য হওয়া উচিত, তা ফুটে উঠেছে:

ভার্য্যা তো সদৃশী তব বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহনতৎপরা,
ছন্দানুবর্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী?

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনে নারীদের অস্বীকার করা হলেও গৃহী বৌদ্ধদের জীবনে নারীকে অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব। তাই গৃহে একজন নারী কেমন হবে, সেই দিকনির্দেশনা আমরা পাই বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে। উল্লেখ না করে পারছি না, বৌদ্ধধর্ম মতে – বোধিসত্ত্ব হলেন তিনিই, যিনি জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং নির্বাণলাভ থেকে বিরত থাকেন এবং বিশ্বের সকল জীবের মুক্তিলাভের উপায় করেন।

* সংক্ষেপে খুল্লহংস জাতক সম্পর্কে পড়ুন।

বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি